2:11 PM
purashree_july_a...

আরোপিত ব্যাপার আছে, ধার করা বিষয় আছে। ম্যাজিক রিয়েলিটির ফিলোজফি উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। কিন্তু 'উত্তরজাহ্নবী'তে কোনও আরোপিত ব্যাপার নয়, কোনও জাদু-বাস্তবতার প্রয়োজন নেই। নিজের মানুষের নিজস্ব কথা ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে।"

উপন্যাসের মত বাংলা ছোটগল্পের জগতেও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অখণ্ড প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। বিচিত্র জীবন, বিচিত্র অনুভব ও অভিজ্ঞতায় লেখা হয়েছে গল্পগুলি। সিরাজ প্রথম গল্প লেখেন 'ইবলিশ' ছদ্মনামে বহরমপুর শহরের 'সুপ্রভাত' পত্রিকায়। গল্পের নাম ছিল কাঁচি। এই নামে তাঁর আর একটি গল্পের নাম ছিল 'তরঙ্গিনীর চোখ'। তারপর স্বনামে অসংখ্য ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন।

গল্পে বাস্তবতা ও অলৌকিকতার মিশ্রণ ঘটিয়ে পাঠকের কৌতূহল জাগিয়েছেন। 'সোনার পিদিম' আদতে আশ্চর্য প্রদীপ যার নাগাল কেউ পায় না। 'জুলেখা' গল্পে নিষ্কাম কৈশোর প্রেমের বেদনা মূর্ত হয়েছে। গল্পের নায়ক কিশোর অঞ্জু জুলেখাকে ভালবেসেছে। অঞ্জু বলে— 'কী অবিশ্বাস্য বিশাল ছিল তার চুল! সেই চুলের বিশালতা আমাকে টানতো। জুলির চুল ধরে আমি খোলাখুলি করতাম। চুলের ভিতর লুকিয়ে মাকে দিতাম টুকি। খিড়কির ছোট্ট পুকুরে সেই চুল ধরেই সাঁতার কাটা শিখেছিলাম। সে ছিল আমার নির্ভরযোগ্য সিঁড়ি।' অচরিতার্থ প্রেম নিয়ে জুলির অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। কিশোর অঞ্জুও উপলব্ধি করে 'আমি বাকি জীবনের জন্য একলা হয়ে গেলাম'।

বিখ্যাত 'রানির ঘাটের বৃত্তান্ত' গল্পে ঘাটের পাশে থাকে পাগলি

সুরেশ্বরী ওরফে সুরিক্ষেপী। লোকের দয়াদাক্ষিণ্যে তার পেট চলে। সেই পাগলির পেটে একদিন একটা বাচ্চা জন্ম নেয়। সবাই মিলে সেই বাচ্চাটির নাম দিল 'ফালতু'। সকলের স্নেহে যত্নে সে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু কে তার বাবা কেউ জানে না। গল্পের শেষে জগন্নাথের মেয়ের সঙ্গে ফালতুর বিয়ের কথা উঠলে জগন্নাথ জানায় ওরা ভাই বোন। শুনে তার মেয়ে আত্মহত্যা করে। ওদিকে ইসমাইল পিতৃত্ব দাবি করে। ফালতু সব দেখে শুনে নির্বিকার থাকে। এরকমই লেখকের 'আলেকজান্ডার', 'সরলপ্রকৃতিপাঠ', 'গণেশ চরিত', 'ভারতবর্ষ', 'মৃত্যুর ঘোড়া', 'বৃষ্টিতে দাবানল', 'সূর্যমুখী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম করা যায় যেখানে ঘটনার গতিপ্রকৃতি পাঠককে এক নির্মল আনন্দের জগতে নিয়ে যায়।

বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্যও সিরাজ প্রচুর লিখেছেন। তাঁর 'কর্নেল' চরিত্রটি কিশোর সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। গোয়েন্দা কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের রহস্যভেদের অপরিসীম ক্ষমতা ছোটদের মনে তাঁকে স্থায়ী আসন করে দিয়েছে। গোয়েন্দা রহস্য গল্পের পাশাপাশি ভূতের গল্পেও তিনি অনবদ্য।

সিরাজ বুঝেছিলেন দ্বন্দ্বহীন প্রকৃতিই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে মানুষের সকল দ্বন্দ্বের হেতু। রাঢ়ভূমির মহাশক্তি সিরাজকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর 'প্রকৃতি' তান্ত্রিকের চৈতন্যময়ী মহাশক্তি— ঠিক এই জায়গাটিতেই তারাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর গভীর আত্মীয়তা। মানব-সম্পর্কের আলো-আঁধারি প্রদেশে জটিল অন্বেষণেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখকজীবনের সার্থকতা। ❑

কলকাতা পুরশ্রী—বিজ্ঞপ্তি

- কলকাতা পৌরসংস্থা প্রকাশিত কলকাতা পুরশ্রী প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।
- কলকাতা পুরশ্রীর মাসিক সংখ্যার দাম ৫ টাকা।
- শারদোৎসবে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
- রচনা নির্বাচনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- কলকাতা সম্পর্কিত গবেষণামূলক রচনাদি অগ্রাধিকার পাবে।
- কপি রেখে রচনা পাঠাবেন। অমনোনীত রচনা কোনও অবস্থাতেই ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাতে হবে। নিজের নাম ও ঠিকানা বানান পরিষ্কার করে লিখতে হবে।
- প্রকাশিত রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব, সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী নয়।
- রচনা প্রয়োজনীয় ছবি সহ ২০০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে।
- পাঠকবর্গের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হয়। যোগাযোগ : সম্পাদক, ১ হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং (তৃতী... কলকাতা- ৭০০ ০৮৭, দূরভাষ - ২২৮৬-১০০০/২২৮৬-১৩০২ এক্সটেনশন - ২৫৪০, ২৬১১,
- কলকাতা পুরশ্রীর যাবতীয় সংখ্যা এই ঠিকানা থেকেই পাওয়া যাবে।
- বই বেশি সংখ্যায় কিনলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্রেতাগণকে কমিশন দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

2:11 PM
purashree_july_a...

হারিয়ে ফেলেনি। সে প্রেরণা চিরন্তন ভালবাসার। পার্টির উপরে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। নাগরিক জীবনবোধ সিরাজের উপন্যাসে এবং গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করলেও তাঁর শিকড় প্রোথিত গ্রামে।

'হেমন্তের বর্ণমালা' উপন্যাসে সিরাজ দেখিয়েছেন শহর যখন বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আলোকিত, টিভি, সিনেমা, ভিডিওতে জমজমাট তখন বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশার অন্ধকারে ডুবে আছে— যারা দু'বেলা খেতে পায় না, পড়তেও জানে না। হেমন্তের পাতার মত ঝরে পড়া সেইসব মানুষের দুঃখের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

আবার 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি' উপন্যাসে শহরের কথা থাকলেও বাতাবরণ গড়ে উঠলেও তিনি যে কামনা-বাসনায়, স্নেহে-প্রেমে, ত্যাগে-তিতিক্ষায়, একাকিত্বের বেদনায় একজন রক্তমাংসের মানুষের বেশি কিছু না।

আসলে এই উপন্যাসে এক অনাবিষ্কৃত প্রত্ন-ইতিহাসের নিজস্ব ভূমিতে সিরাজ খুঁজে পেতে চেয়েছেন উনিশ শতকের ইসলামি জনমানসের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে— যে পরিচয়ে বারংবার ফিরে এসেছে যৌথ পুরাণ (racial myth)। সিরাজ নিজেই বলেছেন— 'অলীক মানুষ বলতে আমি বুঝিয়েছি 'মিথিক্যাল ম্যান'।

সিরাজ দেখিয়েছেন লৌকিক-অলৌকিক, প্রেম-অপ্রেম, মায়া-

বাস্তবতা পরস্পর বিরোধী গতির মাঝখানে সংগ্রামরত মানুষ কীভাবে অলীক মানুষে পরিণত হয়, কীভাবে সে নিজেই হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য 'মিথ'। সমস্ত উপন্যাস জুড়ে রয়েছে এক জাদু-বাস্তবতার আঙ্গিক; দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের ক্রমাগত যাতায়াত। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত উনিশ শতকের মুসলিম মানসে ঘুরে-ফিরে এসেছে অলৌকিক দৈব বিশ্বাস। ইসলামি মিথের দূরগামী মায়াবী লোকে তারা নির্মাণ করে দিয়েছে তাদের নিজস্ব আধিভৌতিক জগৎ।

সিরাজের অন্যতম প্রিয় উপন্যাস 'জানমারি' যাতে ইতিহাস, পুরাবৃত্ত মিলিয়েছেন আঞ্চলিকতায় গড়ে তুলেছেন আধুনিকতার এক ভিন্ন দিগ্‌বলয়। যেখানে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি মানুষকে সন্ত্রাসের পৃথিবীতে নির্বাসিত করে। ক্ষমতাবানদের রাজনৈতিক চরিতার্থতায় দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ ঘাতকে পরিণত হয়, মেতে ওঠে পারস্পরিক হনন-উল্লাসে। এইভাবে ভয়, বীভৎসতা, মৃত্যু মিলেমিশে তৈরি করে এক বধ্যভূমি 'জানমারি'। উপন্যাসের শেষাংশে আছে কোনও এক যীশুখ্রিস্টকে (সোনারু খ্যাপা) ক্রুশবিদ্ধ করার ঘটনা। ওহিদের ব্যাটা আনারুলের নির্দেশে আড়কাঠে কাঁধে সোনারুকে কবরস্থানে আনা হয়। গর্ত খুঁড়ে কাঠটি পোঁতাও হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ফুঁড়ে কয়েকজন বেরিয়ে এসে ওই আড়কাঠে খ্যাপার হাত-পা বেঁধে দিতে থাকে। সে ভাবে মজা। সুর করে বলে— 'ভালা মজা... ভালা মজা'। আকাশে মেঘ ডাকে, বিদ্যুৎ চমকায়; বৃষ্টি নামে। খ্যাপা দেখে, ঝলকে ঝলকে বজ্রবিদ্যুতে গোরস্থানে প্রোথিত আড়কাঠটি যা প্রকৃতপক্ষে একটি ক্রুশদণ্ড, ঝলসে যাচ্ছিল আর অঝোর ধারায় ভিজছিল। তার গায়ে বাঁধা সোনারুর শরীরে এবার একে একে বিঁধে যায় 'হুকুমে তৈরি তীক্ষ্মাগ্র আট ইঞ্চির পেরেকগুলিন'। সত্যিই যথাযথ 'মরিয়মপুত্রে' পরিণত হয়। তার মুখে ফুটে ওঠে অদ্ভুত দুর্বোধ্য সুপ্রাচীন ভাষায় সেই আর্ত চিৎকার— 'এলি এলি লামা সা- বাক্তানি...'

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এই উপন্যাসে আশ্চর্য দক্ষতায় খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার সঙ্গে ইসলামি পুরাণের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। সিরাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'উত্তরজাহ্নবী'। সম্প্রতি প্রয়াত জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "সিরাজের 'উত্তরজাহ্নবী' উপন্যাসের স্বর্ণ চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় চরিত্র"। কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন, "আমার কিন্তু 'অলীক মানুষ'-এর থেকে 'উত্তরজাহ্নবী' অনেক বেশি রিপ্রেজেন্টেটিভ উপন্যাস মনে হয়। 'অলীক মানুষ'-এ কোথাও একটা আরোপিত ব্যাপার আছে, ধার করা বিষয় আছে। ম্যাজিক রিয়েলিটির ফিলোজফি উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। কিন্তু 'উত্তরজাহ্নবী'তে কোনও আরোপিত ব্যাপার নয়, কোনও জাদু-বাস্তবতার প্রয়োজন নেই। নিজের মানুষের নিজস্ব কথা ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে।"

উপন্যাসের মত বাংলা ছোটগল্পের জগতেও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অখণ্ড প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। বিচিত্র জীবন, বিচিত্র অনুভব ও অভিজ্ঞতায় লেখা হয়েছে গল্পগুলি। সিরাজ প্রথম গল্প লেখেন 'ইবলিশ' ছদ্মনামে বহরমপুর শহরের 'সুপ্রভাত' পত্রিকায়। গল্পের নাম ছিল কাঁচি। এই নামে তাঁর আর একটি গল্পের নাম ছিল 'তরঙ্গিনীর চোখ'। তারপর স্বনামে অসংখ্য ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন।

সিরাজের কালজয়ী গল্প 'গোধ্ন'। গল্পটি শরৎচন্দ্রের কালজয়ী 'মহেশ' গল্পটির সঙ্গে তুলনীয়। গল্পের মুসলমান চাষীটিকে তার নিজের অজান্তে বিক্রি করা বলদটির মাংস খেতে বাধ্য করা হয়। যখন সে জানতে পারল তার পোষা বলদের মাংস তাকে খেতে হয়েছে, সে তখন সে বলে আমাকে বেটার গোস্ত খেতে হল, হারাম খেতে হল। এই গল্পের মানবিক দিকটাই গল্পের আত্মা।

সিরাজের বিখ্যাত 'মানুষভূতের গল্প' শুরু এক সাসপেন্সের মধ্যে দিয়ে— 'আলোরানী হেরিকেনের দম কমিয়ে দেখে ঘনশ্যামের মৃত বাবা ফিরে এসেছে যার সৎকার করেছে কিছু দিন আগে। বটকেষ্ট তার এই অবস্থাকে কাজে লাগানোর জন্যে বলে— 'আমি এখন মরা মানুষই বটে। কাজেই চেপে যা।... আমি যে বেঁচেবর্তে আছি, একেবারে চেপে যা।' তাদের তেঁতুলতলার জমিটা হরেনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য বটকেষ্টর বৌমা আলোরানী ঝান্ডা পুঁতে দিয়ে আসে। 'বটকেষ্টর মরার খবর পেয়ে হরেন নিশ্চিন্ত হয়ে জমিটাতে কলাই বুনে দিয়েছে। সারের জোরে দেখতে দেখতে কাঁপালো সবুজ হয়ে উঠেছে জমিটা... তার কাছে খুব গর্বের জিনিস এই মাটিটুকু।

এইসময় কলাইয়ের জমির মাঝখানে পোঁতা কঞ্চিতে লটকানো একটা ঝান্ডা দেখে হরেন জ্বলে ওঠে। আবার ঠিক এই সময় তেঁতুল গাছের ওপর থেকে কেউ ডাকল 'হম্মা নাকিরে! ও হম্মা'। হরেন মুখ তুলতেই আবছা আঁধারে একটা মূর্তি দেখল, একটু ওপরে মোটা একটা ডালে বসে বসে দুটো ঠ্যাং দোলাচ্ছে। হরেন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল— 'কে? কে?' মুহূর্তের মধ্যে এক অলৌকিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। 'একটি ভালুকের উপকথা' গল্পে রেশমকুঠির ভালুকটি জনশ্রুতিতে অদ্ভুত ও অলৌকিক হয়ে ওঠে। যাকে ঘিরে দু'পয়সা কামিয়ে নেয় ধর্মব্যবসায়ীর দল।

'উড়ো চিঠি' গল্পের চিঠিতে লেখা হয় খড্ডা গ্রামে আমোদ আলি মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে মরণাপন্ন। তাকে কানুডিহিতে ফিরিয়ে না আনলেই সর্বনাশ। উড়ো চিঠির সেই বার্তা পেয়ে গাঁয়ের যুবকেরা মোড়লের কথামত গরুর গাড়ি নিয়ে খড্ডার দিকে যায়। অনেক খুঁজেও গ্রামের হদিশ পায় না। গল্পকার সিরাজ জানিয়েছেন— 'খড্ডা আসলে জিনের দেশ। আমোদ আলিকে জিনে নিয়ে গিয়েছিল।' গল্পকার এখানে লোকবিশ্বাসকে অলৌকিকতার মোড়কে গল্পটিকে চমকপ্রদ করে তুলেছেন। 'ডালিমগাছের জিনটি' এবং 'সোনার পিদিম' গল্পে বাস্তবতা ও অলৌকিকতার মিশ্রণ ঘটিয়ে পাঠকের কৌতূহল জাগিয়েছেন। 'সোনার পিদিম' আদতে আশ্চর্য প্রদীপ যার নাগাল কেউ পায় না। 'জুলেখা' গল্পে নিষ্কাম কৈশোর প্রেমের বেদনা মূর্ত হয়েছে। গল্পের নায়ক কিশোর অঞ্জু জুলেখাকে ভালবেসেছে। অঞ্জু বলে— 'কী অবিশ্বাস্য বিশাল ছিল তার চুল! সেই ... আমাকে টানতো। জুলির চুল ধরে আমি খোলা... ভিতর লুকিয়ে মাকে দিতাম টুকি। খিড়কির ... ধরেই সাঁতার কাটা শিখেছিলাম। সে ছিল আমার ... অচরিতার্থ প্রেম নিয়ে জুলির অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়... উপলব্ধি করে 'আমি বাকি জীবনের জন্য একলা হয়ে গেলাম'।

বিখ্যাত 'রানির ঘাটের বৃত্তান্ত' গল্পে ঘাটের পাশে থাকে পাগলি

নায়িকা নিশিলতা গ্রাম্য সারল্য ছেড়ে রসবতী যুবতী হয়ে উঠেছে রানীচকের মেলায় এসে। মাতৃহারা এই মেয়েটি বিনোদিনীর আদরে মানুষ। পিতৃত্বের অধিকার লোচন দেখায়নি বলে 'গভীর দুঃখে নিশি অনুভব করেছিল— জীবনে এই প্রথম সে জানল সত্যি তার আপন বলতে কেউ নেই যেন।' তার বুকের মধ্যে এক অব্যক্ত আর্তনাদ বুদবুদ হয়ে ওঠে। মেলায় এসে সে এই বেদনার, নিঃসঙ্গতার

পদ্মা-গঙ্গ-অজয়-ময়ূরাক্ষীর যোজনবিস্তৃত অববাহিকায় গ্রামগঞ্জ, হাট মেলায় এই ধ্রুপদী লোকনাট্যকে ঘিরে যে আশ্চর্য লোকজীবন ছড়িয়ে আছে তার কুশীলবরা ছড়িয়ে আছে এই উপন্যাসে। সমাজের মূলস্রোত থেকে বহুদূরে অনাদরে অবজ্ঞায় সাধারণের তীব্র কৌতূহলে কেবল লোকবিশ্বাসকে আঁকড়ে বেঁচে আছে যে অর্ধনারীশ্বর মানুষজনেরা, তাদের যাপনচিত্র পরিবেশিত হয়েছে এখানে।

উপন্যাসের নায়ক সনাতনকুমার রায় বা সনাতন মাস্টার সিরাজের আর এক সত্তা। সনাতনও সিরাজের মতই সাঁওতালপাড়ার আলকাপ দলের মাস্টার। সিরাজের মত সনাতনও বাঁশি বাজাত আলকাপ দলে। সুবর্ণর প্রতি সনাতনের ছিল অদ্ভুত দুর্বলতা। অথচ সুবর্ণ নারীবেশী পুরুষ। অথচ যে সুধা তাকে ভালবেসেছিল এবং বিয়ের পর প্রৌঢ়, পণ্ডিত স্বামী নিয়ে সুখী হয়নি, তার ভালবাসার মূল্য সনাতন দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সুধা ধর্ষিতা ও খুন হয় আলকাপ দলের নষ্ট চরিত্রের লোকদের হাতে। 'মায়ামৃদঙ্গ' আসলে কয়েকজন দুঃখী মানুষের বর্ণলিপি, অর্ধনারীশ্বর মানুষদের অন্তরের বেদনার কাহিনি।

সিরাজের উপন্যাসগুলি আসলে গ্রামবাংলার মানুষজনের সুখ-দুঃখের কাহিনি। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে সিরাজ লিখেছেন 'সংশপ্তক', 'বাসস্থান', 'তখন কুয়াশা ছিল', 'হেমন্তের বর্ণমালা', 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি', 'বসন্ততৃষ্ণা', 'নদীর মতন', 'অলীক মানুষ' প্রভৃতি উপন্যাস। 'সংশপ্তক' উপন্যাসে ধ্রুব চেয়েছিল সমাজ বদলাতে কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছিল খোঁড়া পা, অকেজো ফুসফুসিত হৃদয়। যদিও লড়াকু মনোভাব সে হারায়নি।

'নদীর মতন', 'তখন কুয়াশা ছিল', 'হেমন্তের বর্ণমালা' ইত্যাদি উপন্যাসে সিরাজ গ্রামকে আশ্রয় করেছেন। 'নদীর মতন' উপন্যাসে শুধু গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ প্রতিচ্ছবি নয়, এই উপন্যাসে দারুণ জোরালো আঁচড়ে আঁকা একটি মেয়ের ছবিও যে কিনা অদ্ভুতভাবে মিশে যেতে চেয়েছিল গ্রামজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। সাধারণ মানুষের কাছে সে হয়ে উঠেছিল 'পঞ্চাতদিদি' অর্থাৎ পঞ্চায়েতদিদি। আর এই হয়ে ওঠার জন্য তাকে কম মূল্য দিতে হয়নি। ছাড়তে হয়েছে স্বামী-সংসারের পিছুটান, সন্তানের স্বপ্নও। এই উপন্যাসের আশ্চর্য চরিত্র, পঞ্চাতদিদি ধরিত্রী পৃথিবীর বদলে যাওয়ার মতই সেও রূপান্তর আর পরিবর্তনের আধুনিক প্রতিমা। ধরিত্রীর সব আছে। স্বামী আছে, সংসার আছে। ধরিত্রী কিন্তু এসবের উপরেও একটি জিনিসকে অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছে— সে হল তার স্বতন্ত্র স্বাধীন জীবনবোধ। ধরিত্রী পঞ্চাতদিদি হলেও নারীত্বের মৌল প্রেরণা হারিয়ে ফেলেনি। সে প্রেরণা চিরন্তন ভালবাসার। পার্টির উপরে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। নাগরিক জীবনবোধ সিরাজের উপন্যাসে এবং গল্পে প্রাধান্য বিস্তার করলেও তাঁর শিকড় প্রোথিত গ্রামে।

'হেমন্তের বর্ণমালা' উপন্যাসে সিরাজ দেখিয়েছেন শহর যখন বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আলোকিত, টিভি, সিনেমা, ভিডিওতে জমজমাট তখন বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশার অন্ধকারে ডুবে আছে— যারা দু'বেলা খেতে পায় না, পড়তেও জানে না। হেমন্তের পাতার মত ঝরে পড়া সেইসব মানুষের দুঃখের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

আবার 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি' উপন্যাসে শহরের কথা থাকলেও নিয়ে এবং যাদের সঙ্গে সৌন্দর্য আর যন্ত্রণায় কেটে গেছে— তাদের নিয়েই এই উপন্যাস'। রাঢ় বাংলার মানুষের জীবন এবং আলকাপ লোকনাট্য দলের সদস্যদের নানা সুখ-দুঃখের, হতাশার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এতে আছে দরিদ্র অন্তেবাসী মানুষজনের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির আদান-প্রদানে কীভাবে নির্মিত হয় লোকায়ত জীবনচর্যা এবং গৌণধর্মের আঞ্চলিক ভিত্তি।

সিরাজ তুলে ধরেছেন মানুষের সমস্যাকে— যে সমস্যা বেঁচে থাকার এবং আদিম কামনার।

স্কুলশিক্ষক ননী ও তার বোন কৃষ্ণাকে নিয়ে এই উপন্যাস। এই দ্বৈত চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে এই উপন্যাসে। ননী মানুষকে ভালবেসে বিয়ের পথে পা বাড়ায়নি। একমাত্র বোন কৃষ্ণাকে নিয়েই তার সংসার। কিন্তু কৃষ্ণার শ্লীলতাহানি ও অপমৃত্যু ননীকে বাক্‌হারা করে দেয়। ননীর অন্তর্লোকে আলোড়িত হয় এক অমোঘ সত্য— 'প্রেম মানুষকে মেরে ফেলে। ভালবাসা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। জন কৃষ্ণাকে মারল। মানুষ ননীকে বাঁচিয়ে রাখল।' এই অন্তর কাঠামোর মধ্যে প্রলম্বিত রয়েছে জগৎ ও জীবনের চলার ছন্দ।

ভালবাসাই সিরাজের কাহিনির মূল সুর যা কখনও আদিমতাকে ঢেকে দেয়। এই ভালবাসার দাবি সোচ্চার হয়েছে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস 'অলীক মানুষ'-এ। বহু পুরস্কারে ভূষিত উপন্যাস সম্পর্কে কারও মনে হয়েছে 'অলীকমানুষ' ইয়োরোপীয় উদ্ধৃতিকে শীর্ষে নিয়ে আসলে এক বিকল্প উপন্যাসের ভাবনা— 'এ উপন্যাসে জিন ও অলৌকিকতা জীবনেরই অন্তর্গত আবার শফি এর থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক করে তোলাও'। কারও কাছে উপন্যাসটি 'প্রাজ্ঞ কথাসাহিত্যিকের প্রৌঢ় জীবনের সত্যোপলব্ধির আখ্যান'। প্রকাশকের দৃষ্টিতে 'এই উপন্যাস বঙ্গভূমির কৃতিত্বের এক সন্ধিকালের প্রামাণ্য দলিল'— যেখানে আছে উনিশ-বিশ শতকের পটভূমিতে এক মুসলিম পীর পরিবারের লৌকিক-অলৌকিক ওতপ্রোত জীবনের কাহিনী'। উপন্যাসটির দুই দিকে আছে পিতা-পুত্র। মৌলানা বদিউজ্জামান ও শফিউজ্জামান, একজন আস্তিক অপরজন নাস্তিক। প্রথমজন ধর্মগুরু এবং ধর্মীয় অলৌকিকতায় বিশ্বাসী এবং অপরজন অনুশাসনের প্রতি বিদ্রোহী। ঈশ্বর মানুষের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন— এ কথা পিতা বিশ্বাস করলেও পুত্র মনে করেন মানুষ নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক। এ ছাড়া উপন্যাসে আছে আবদুল বারি চৌধুরী, বদিউজ্জমানের বিবি সাইদা-উন-নিসা, ইংরাজি শিক্ষিত লম্পট বড়গাজী, জমিদারকন্যা রত্নময়ী, বদিউজ্জামানের অপর দুই ভাই নুরুজ্জামান ও মনিরুজ্জামান, রুকু, দিল আফরোজ, কাল্লু পাঠানের ছোট বউ সিতারা প্রভৃতি চরিত্র। অলীক মানুষ বদিউজ্জামানের কণ্ঠ ছিল জোরালো এবং উদাত্ত— ঔপন্যাসিক সিরাজ যার তুলনা করেছেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে। এহেন বদিউজ্জামান মুসলমানের কুসংস্কার মনে পেয়ে যান পীরের আসন। তার চারপাশে অলৌকিকতার বাতাবরণ গড়ে উঠলেও তিনি যে কামনা-বাসনায়, স্নেহে-প্রেমে, ত্যাগে-তিতিক্ষায়, একাকিত্বের বেদনায় একজন রক্তমাংসের মানুষের বেশি কিছু না।

আসলে এই উপন্যাসে এক অনাবিষ্কৃত প্রত্ন-ইতিহাসের নিজস্ব ভূমিতে সিরাজ খুঁজে পেতে চেয়েছেন উনিশ শতকের ইসলামি জনমানসের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে— যে পরিচয়ে বারংবার ফিরে এসেছে যৌথ পুরাণ (racial myth)। সিরাজ নিজেই বলেছেন— 'অলীক মানুষ বলতে আমি বুঝিয়েছি 'মিথিক্যাল ম্যান'।

সিরাজ দেখিয়েছেন লৌকিক-অলৌকিক, প্রেম-অপ্রেম, মায়া-

রাঢ়দেশ। দুজনের কল্পনা রাঢ় প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রশ্রয় পেয়েছে।

সিরাজকে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের লেখা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তারাশঙ্করের শাক্তভাব এবং বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের কথা ও তাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। রাঢ়ের মাটি ও সমাজ মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর রচনায়। পারিবারিক প্রেরণা থেকেই সিরাজের লেখালেখির সূত্রপাত। মুর্শিদাবাদ জেলার খোসবাসপুর গ্রামে তাঁর জন্ম ১৯৩০ সালের ১৪ অক্টোবর। বাবা সৈয়দ আবদুর

সিরাজের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নীলঘরের নটী' (১৯৬৬ সালে প্রকাশিত)। নাগরিকতা নয়, গ্রামীণ ভাব-ভাবনা নিয়েই তিনি হাজির হন বাংলা সাহিত্যের দরবারে। তারাশঙ্করের রুক্ষ রাঢ়ভূমির পর, বিভূতিভূষণের কাব্যময় অরণ্যকথার পর এমন অন্তরঙ্গ চেনা অথচ বিষণ্ণ শ্রমজীবনের কথা আর কেউ লেখেননি। স্বচ্ছ সামাজিক বোধের প্রজ্ঞায় অসাধারণ মানবিক সংবেদনায় পারিপার্শ্বের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের নিখুঁত বর্ণনায়, তারাশঙ্কর-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি নির্মাণ করেছেন একটি তৃতীয় ভুবন। অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্য

দিয়েই উঠে আসে তাঁর চরিত্রগুলি।

তাঁর শৈশব থেকে কৈশোর জীবন কেটেছে গ্রামে। শিক্ষাদীক্ষা প্রথমে গ্রামে, পরে শহরে। তাই তাঁর লেখায় গ্রাম ও শহর— উভয়েরই সহজ সহাবস্থান। গ্রামগঞ্জের হালহকিকত ছিল তাঁর নখদর্পণে। গ্রামের হেরিডিটি, তার রিচুয়ালস, পারস্পেকটিভ সমেত উঠে আসে তাঁর উপন্যাসে। ঐকান্তিক প্রয়াস আর নিরলস সাধনাতেই সেগুলি তাঁর সাহিত্যে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। তাঁর উপন্যাস বা গল্প গ্রামভিত্তিক। চরিত্রগুলি গ্রামীণ পরিবেশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সিরাজের লেখক জীবনের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা মুখ্যত ঘটেছিল 'তৃণভূমি' উপন্যাসে (১৯৭০ সালে প্রকাশিত)। যে আদিমতা, বন্যতা, সবুজ প্রকৃতি সিরাজের অন্বিষ্ট, তাকে এই 'তৃণভূমি'র মধ্যে তিনি রূপ দিয়েছেন। এই উপন্যাসের পটভূমি মুর্শিদাবাদের দ্বারকা নদীতীরবর্তী দিগন্ত বিস্তৃত তৃণাঞ্চল। সোনাটিকুরি পেরিয়ে ঢালু আবাদী মাঠের পর কূলহীন ধূসর সমুদ্রের মত তৃণভূমি। এই তৃণভূমির জগৎই তাঁর লেখকজীবনের মূল ভূখণ্ড। মুর্শিদাবাদের হিজলবন ও দ্বারকানদী এক অপরূপ সৌন্দর্যে— হিজলবনের প্রকৃতিলালিত মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনি এখানে চিত্রিত। উপন্যাসের নায়ক নিশানাথ চৌধুরী জমিদার আদিনাথ চৌধুরীর ছেলে, জমিদারি পরিবেশে লালিত-পালিত হলেও প্রকৃতির রহস্যমন্ডিত গোপনলোকে তার অবিরাম যাওয়া আসা। তার আজীবন পরিচিত তৃণভূমি ছেড়ে সে কোথাও যেতে পারেনি। ছেলেবেলায় সারা বর্ষাকালে তৃণভূমির যে চেহারা নিশানাথ দেখেছে, তা এক অবিশ্বাস্য সমুদ্রের। তার কোনও তুলনা সে খুঁজে পায় না।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার ছায়া, আর্থ-সামাজিক বিক্ষোভ আর ভাঙনের তরঙ্গে অশান্ত হয়ে উঠেছিল তৃণভূমি অঞ্চল। লৌকিক পালপার্বণ সম্বন্ধে গ্রামজীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের সংঘর্ষ চিত্রিত হয়েছে। প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাত্রার প্রতীকরূপে নদীর বিশিষ্ট ভূমিকার কথাও এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

কথাকার সিরাজের 'নিশানাথ', 'হিজলকন্যা' ও 'বন্যা' এই তিনটি উপন্যাস ১৩৭৪ থেকে ১৩৭৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। এই তিনটি উপন্যাসে তিনরকমের পটভূমি এবং তিন ধরনের নারীকে এনেছেন। গ্রাম ও শহরের সংঘাতে তাদের মন ও চরিত্র কীভাবে আলোড়িত হল তাও দেখিয়েছেন।

'নিশিলতা' উপন্যাসে রানীচকের রুদ্রদেবের মেলা পটভূমি রচনা করেছে। বিনোদিনী তার যুবতী ভাইঝি নিশিলতাকে নিয়ে মেলায় এসেছে পান বেচতে। ব্যক্তিজীবনে বিনোদিনী সুখী নয়। তার স্বামী মন্মথ অপদার্থ। ফলে সংসার তার সুখের হয়নি। মেলায় গিয়ে নানাজনের সঙ্গে কথা বলে তার প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

নায়িকা নিশিলতা গ্রাম্য সারল্য ছেড়ে রসবতী যুবতী হয়ে উঠেছে রানীচকের মেলায় এসে। মাতৃহারা এই মেয়েটি বিনোদিনীর আদরে মানুষ। পিতৃত্বের অধিকার লোচন দেখায়নি বলে 'গভীর দুঃখে নিশি অনুভব করেছিল— জীবনে এই প্রথম সে জানল সত্যি তার আপন বলতে কেউ নেই যেন।' তার বুকের মধ্যে এক অব্যক্ত আর্তনাদ বুদবুদ হয়ে ওঠে। মেলায় এসে সে এই বেদনার, নিঃসঙ্গতার দুঃখ ভুলেছে। মত্ত, ঘৃণ্য গোবরাকে জয় করার মধ্যে তার নারীসুলভ গর্ব প্রকাশ পেয়েছে। গোবরা নিশির সান্নিধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত গোবরার মৃত্যুতে নিশি আবার একা হয়ে গেছে। সিরাজ এই নারী চরিত্রের মধ্যে নিঃসঙ্গতা আর কান্নাকে মমতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

'হিজলকন্যা' উপন্যাসের ভূমিকায় সিরাজ 'এক নয়া আবাদের কিস্‌সা' বলেছেন, যেখানে আছে মাটির যৌবনের কাহিনি। এই উপন্যাসের তিন নায়িকা হিজলকন্যা বনচরা মেয়ে রাহেলা, ফুলি, চুমকি প্রত্যেকেই একাকিত্বের শিকার। লেখকের দেখা কান্দি মহকুমার হিজল অঞ্চলের বাঘিনী মেয়ে কদরআলির মা-র ছায়া আছে রাহেলার মধ্যে, যে হিজলের যুবাদের নেতৃত্ব দেয়। জমির অধিকার বজায় রাখতে তার সাহসের কথা গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে যায়। এই রাহেলার সঙ্গে বড় বাড়ির ছেলে আব্বাসের প্রেম ছিল। কিন্তু কুলমর্যাদায় তফাত হওয়ায় তাদের মধ্যে বিয়ে হয়নি। 'রাহেলা চিরজীবন অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে বুড়ি হয়ে গেল'। ফজল শেখের কন্যা ফুলি বা ফুলকি তার প্রাণপ্রিয় রবার্টকে নিজের অজান্তে হত্যা করে ফেলে। সম্বিত ফিরে পেয়ে তার করুণ আর্তি 'গোরাসাহেব কেনে তুমাকে আমি মারলাম?' এক সমুদ্র ব্যথা নিয়ে ক্লান্ত হয়ে হারিয়ে গেছে ফুলি।

আর বেদের মেয়ে চুমকি ভালবেসেছিল আকাশকে। অথচ আকাশের মা তার অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আকাশ চুমকির দেহের রহস্যে ডুব দিয়েছে। এদিকে আবেদালি ঘরে বৌ বানু থাকতে বিয়ে করতে গেছে। ঘরে সতীন আসবে বানু মেনে নিতে পারেনি। তাই সে সতীন আসার আগেই আত্মহত্যা করেছে। বানু হিজলকন্যা নয়, তবু সে হিজলকন্যার মতই অসুখী আর একা।

'বন্যা' উপন্যাসের নায়িকা ধনী ঘরের মেয়ে লীলা এক অর্থে 'হিজলকন্যা'। ছেলেবেলা থেকেই সে বুনো, গেছো স্বভাবের মেয়ে। এই বন্য মেয়ে শেষ পর্যন্ত বিয়ের পরে হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। অলস, নিষ্কর্মা বউভক্ত সত্যকে সে মানিয়ে নেয়। সত্যর বন্ধু সুখেনের সঙ্গে পরিচয়ের পর লীলার জীবন পরিবর্তিত হয়। সুখেনের ডাকে লীলা ঘর ছাড়ে। তার ডাকে লীলার ভিতরের 'হিজলকন্যা' আবার জেগে ওঠে।

'মায়ামৃদঙ্গ' (১৯৭২) উপন্যাস একাধারে সিরাজের আত্মজীবনী ও ডকুমেন্টারি উপন্যাস। আলকাপ-জীবনের দিনযাপন ও লৌকিক অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ তাপে উষ্ণ হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসের আখ্যানবৃত্ত। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ছ-সাত বছর সিরাজ নিজে জড়িত ছিলেন আলকাপ দলের সঙ্গে। তাঁর নিজের কথায় : 'প্রথম যৌবনের ছ-সাতটা বছর— তার মানে খুব কম করে ধরলেও আড়াই হাজার দিন আর আড়াই হাজার রাত আমার যা নিয়ে এবং যাদের সঙ্গে সৌন্দর্য আর যন্ত্রণায় কেটে গেছে— তাদের নিয়েই এই উপন্যাস'। রাঢ় বাংলার মানুষের জীবন এবং আলকাপ লোকনাট্য দলের সদস্যদের নানা সুখ-দুঃখের, হতাশার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এতে আছে দরিদ্র অন্তেবাসী মানুষজনের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির আদান-প্রদানে কীভাবে নির্মিত হয় লোকায়ত জীবনচর্যা এবং গৌণধর্মের আঞ্চলিক ভিত্তি।

2:11 PM
purashree_july_a...

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাংলা কথাসাহিত্য

অলক মণ্ডল

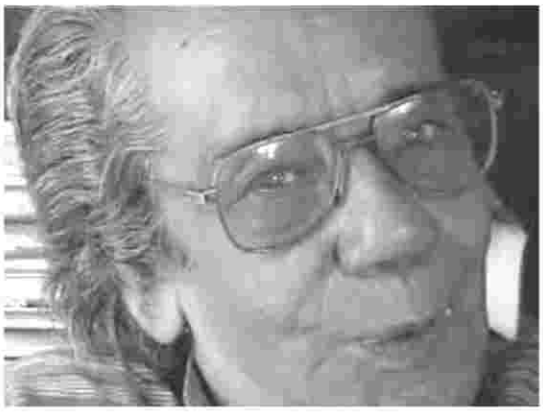

বাংলা কথাসাহিত্য পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২)। শক্তির স্বাতন্ত্রে বাংলা সাহিত্যে তিনি শুধু বিশিষ্ট নয়— ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরাধিকার সচেতন বিংশ শতাব্দীর বাঙালি কথা- সাহিত্যিক— অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতা যিনি এই দুইকেই বিচিত্রভূমিতে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে সিরাজই সেই বিরল কথাসাহিত্যিকদের একজন যিনি তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে এনেছেন এই দেশের মাটি ও মানুষকে, গদ্যের অন্তরে ও বাহিরে পরতে পরতে মাখিয়ে দিয়েছেন সৌদামাটির আঘ্রাণ। ভারতবর্ষের চিরায়ত গ্রামের পটটিকে তিনি যে অনুপুঙ্খভাবে চিনেছেন তা তাঁর রচনাগুলির ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রামের মাটি, মানুষ— তার বহু বছরের লোকায়ত ঐতিহ্য, প্রবাদ-প্রবচন, মিথ, কিংবদন্তি, বিশ্বাস, সংস্কার এবং সর্বোপরি গ্রামের মানুষজনের মানসলোক— দীর্ঘকাল ধরে সেই জীবনের গভীরে তিনি নিরলস ডুব দিয়েছেন।

সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্নসাহিত্য— অধ্যয়নের পাশাপাশি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষের পট ও পটধৃত স্বাতন্ত্র্যকে তিনি অনুধাবন করেছিলেন নিবিষ্টমনে। এসব ভাবনার মধ্যে মানববিদ্যাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর ভাবনার বিষয় ছিল মানুষ। জট-জটিলতা গ্রন্থিল সম্পর্কে সত্তার অবৈকল্য ও বিকারে সে মানুষের বিপন্নতার মূর্তি সেটাই ছিল তাঁর বিষয়। তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখ দিয়েই আমরা গ্রামবাংলার প্রকৃতি, মানুষ এবং সামাজিক ভূ-স্তরের কম্পনকে দেখতে শিখেছি। তারাশঙ্কর ও মুস্তাফা সিরাজের মৌলিক পটভূমি রাঢ়দেশ। দুজনের কল্পনা রাঢ় প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রশ্রয় পেয়েছে।

সিরাজকে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের লেখা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তারাশঙ্করের শাক্তভাব এবং বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের কথা ও তাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। রাঢ়ের মাটি ও সমাজ মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর রচনায়। পারিবারিক প্রেরণা থেকেই সিরাজের লেখালেখির সূত্রপাত। মুর্শিদাবাদ জেলার খোসবাসপুর গ্রামে তাঁর জন্ম ১৯৩০ সালের ১৪ অক্টোবর। বাবা সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসি লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মানুষ। লেখালেখিও করতেন। মা আনোয়ারা বেগমও ছিলেন লেখিকা। মায়ের প্রভাব সম্পর্কে সিরাজ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন— 'প্রত্যক্ষভাবে আমার মা আনোয়ারা বেগমকে বাল্যেই লেখাপড়া করতে দেখেছি। তিনের দশক থেকেই কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মায়ের কবিতা-প্রবন্ধ-গল্প বেরিয়েছে। ... কাজেই বাল্যেই আমার মধ্যে লেখালেখির প্রবণতাটা সঞ্চারিত হয়েছিল।' (সাক্ষাৎকার– রবিবারের সকালবেলা, ৭ আগস্ট ২০১১)।

সিরাজের লেখা শুরু কবিতা দিয়ে। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শেষ-অভিসার' দিয়ে কবিতার জগৎ থেকে সিরাজ চলে আসেন গদ্যের জগতে। 'কিংবদন্তীর নায়ক' উপন্যাস দিয়েই যাত্রা শুরু হলেও সিরাজের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নীলঘরের নটী' (১৯৬৬ সালে প্রকাশিত)। নাগরিকতা নয়, গ্রামীণ ভাব-ভাবনা নিয়েই তিনি হাজির হন বাংলা সাহিত্যের দরবারে। তারাশঙ্করের রুক্ষ রাঢ়ভূমির পর, বিভূতিভূষণের কাব্যময় অরণ্যকথার পর এমন অন্তরঙ্গ চেনা অথচ বিষয় শ্রমজীবনের কথা আর কেউ লেখেননি। স্বচ্ছ সামাজিক বোধের প্রজ্ঞায় অসাধারণ মানবিক সংবেদনায় পারিপার্শ্বের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের নিখুঁত বর্ণনায়, তারাশঙ্কর-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি নির্মাণ করেছেন একটি তৃতীয় ভুবন। অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্য

দিয়েই উঠে আসে তাঁর চরিত্রগুলি।

তাঁর শৈশব থেকে কৈশোর জীবন কেটেছে গ্রামে। শিক্ষাদীক্ষা

দুঃখ ভুলেছে। মত্ত, ঘৃণ্য গোবরাকে জয় করার মধ্যে তার নারীসুলভ গর্ব প্রকাশ পেয়েছে। গোবরা নিশির সান্নিধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে।

কলকাতা
পুরশ্রী
২০ আগস্ট, ২০১৩
নবপর্যায় ১৩শ বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

বিগত দেড়শো বছর ধরে বাঙালি চিন্তায়, মননে, জীবনচর্চায় অনেক মনীষীদের সারা জীবনের সাধনা ও সিদ্ধিকে উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করেছে। তাঁদের স্মরণের মাধ্যমে পূর্ব ইতিহাসের পথে আরও একবার হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দানকেও স্বীকার করা যায়। এই ভাবনায় আমরা বরাবরই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করি। এবারও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মুদ্রণ বিষয়ক লেখা বা শতবর্ষে পি. সি. সরকার নামক লেখা, সর্বোপরি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সার্ধশততম বর্ষ উপলক্ষে দুটি লেখা এই সংখ্যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

এই সঙ্গে অন্যান্য নিয়মিত বিভাগগুলি রয়েছে। পত্রিকা প্রকাশের বিলম্বের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আগামী বছর থেকে পত্রিকা ঠিক সময়ে প্রকাশিত হবে।

সূচিপত্র

- পুরনো আলোকচিত্রে — চাঁদপাল ঘাট ৪
- মুদ্রণশিল্পে উপেন্দ্রকিশোর **স্বপনকুমার রায়** ৫
- বাঙালির পরিভাষায় সর্বকালের এক মিথ : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় **অশোককুমার রায়** ৮
- কলকাতায় আশুতোষের জন্মশতবার্ষিকী পালন ১১
- শতবর্ষে পি. সি. সরকার **শঙ্কর ঘোষ** ১৩
- সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাংলা কথাসাহিত্য **অলক মণ্ডল** ১৭
- কলকাতা বিচিত্রা ২২
- জনপদের বিবর্তনের ইতিহাস **মধুছন্দা মৈত্র** ২৮
- পৌরসংস্থা সংবাদ ৩০

উপদেষ্টা মণ্ডলী : দেবাশিস ভট্টাচার্য, শুভাশিস মৈত্র ও আশীষ চট্টোপাধ্যায়

প্রধান সম্পাদক : **হরিহরপ্রসাদ মণ্ডল** • সম্পাদক : **অরুণকুমার রায়** • সহযোগী : **তরুণ সেনগুপ্ত, কিশোরকুমার গোস্বামী, সুজাতা শাস্ত্রী সরকার ও অনাদিকৃষ্ণ নন্দী**
কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষে অরুণকুমার রায় কর্তৃক, ১ হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং (৩য় তল), কলকাতা-৭০০ ০৮৭, দূরভাষ ২২৮৬-১৩০২, ফ্যাক্স নং - ২২৮৬-১০১৩, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক নবপ্রেস প্রাঃ লিঃ, ৬৬ গ্রে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।

Published by Sri Arunkumar Roy on behalf of Kolkata Municipal Corporation from 1, Hogg Street, Hogg Building (3rd Floor), New Market, Kolkata-700 087, Phone - 2286-1302, Fax - 2286-1013 and printed from Nabapress Pvt. Ltd. 66, Grey Street, Kolkata-700 006